পুণ্যপদপরশে

‘করুণা তোমার কোন পথ দিয়ে...’

প্রব্রাজিকা আপ্তকামপ্রাণা

পারিভাষিক শব্দান্তর যতই থাকুক, ভারতের সব দার্শনিক সম্প্রদায়েরই উদ্দেশ্য ‘মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে ব্রহ্মফলটি খাবার চেষ্টা’ করা, অর্থাৎ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। জ্ঞান, মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ—এসব পারিভাষিক শব্দে এই পরম পুরুষার্থটিকে নির্দেশ করা হয়।

মায়ার ছাল ছাড়িয়ে ব্রহ্মফল চাখার পর, অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চকে বাধিত করে পরম পুরুষার্থলাভের পর, চরম লক্ষ্যে উপনীত মানুষটি তাঁর ইতিপূর্বে ফেলে-দেওয়া মায়া-খোসারূপ যে-জগৎ, তার প্রতি কী ব্যবহার করেন—এটি একটি কূট দার্শনিক প্রশ্ন।

এর উত্তর নানাভাবে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ‘‘বিচার করে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, ‘আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ।’’[১] এইরকম জ্ঞানী জগতের প্রতি দৃক্‌পাত বা ভ্রূক্ষেপ করেন না, মন থেকে জগতকে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

দ্বিতীয়ত কোনও কোনও জ্ঞানী জগতকে ভগবানেরই শক্তির প্রকাশ বলে মনে করেন। আচার্য শংকর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বলেছেন ‘অচিন্ত্যরচনারূপস্য জগতঃ...’ ইত্যাদি; এবং মায়াকে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এরকম মনোভাবাপন্ন জ্ঞানী জগতের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করলেও উদাসীন থাকেন; কারণ জগতের সব ব্যাপারই যে মিথ্যা—এই দৃঢ়বোধ তাঁর থাকে।

তৃতীয়ত কোনও কোনও জ্ঞানী খুবই মধুরস্বভাব—জগতকে মিথ্যা বলে অনুভব করেও জগতের দুঃখে তাঁরা বিচলিত হন এবং জগতকে ভগবানেরই প্রতিরূপ মনে করে তার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত উপমার মতো পাঁচিলের ওপারে আনন্দ দেখেও এঁরা পূর্বোক্ত জ্ঞানীদের মতো সেখানে লাফিয়ে না পড়ে, চিৎকার করে অপর সকলকে আনন্দের খবর জানাতে থাকেন।

এই তৃতীয়রকম জ্ঞানীদের অবস্থা থেকেই ‘করুণা’ ব্যাপারটির উদ্ভব এবং এই প্রবন্ধেরও সূত্রপাত। করোতি চিত্তং পরদুঃখহরণায় ইতি করুণা—অন্যের দুঃখ হরণ করার মনোবৃত্তিই করুণা। সমাধিলীন—বৌদ্ধধর্মের ভাষায় বললে নির্বাণলীন পুরুষের অন্তরে কীকরে করুণা জাগে, সে-সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি দেওয়া যায়। উক্ত তৃতীয়রকম জ্ঞানী—যাঁর দৃষ্টিতে ‘সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম’ কিংবা ‘সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষঃ’ অথবা ‘রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব’—পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ক্রন্দনরত ব্রহ্মকে

দেখে তাঁর হৃদয় কাঁদবেই। তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাই এই নিজেকে-না-জানা ব্রহ্মকে সাহায্য করার জন্য।

এই উদ্দেশ্যটি নির্দেশ না করলে জ্ঞানীর কর্ম হয়ে পড়ে নিরর্থক কিংবা স্বার্থপর—নিজের দেহসুখের জন্য বা মানযশের জন্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আচার্য শংকরের কার্যাবলিকে করুণাপরবশ হয়ে লোককল্যাণের জন্য বলে অভিহিত করা চলে। নতুবা জ্ঞানলাভের পর মায়ার প্রপঞ্চ এই জগতের জন্য তাঁর ভাষ্যরচনা, মতপ্রচার, পরমতখণ্ডন, তীর্থ উদ্ধার, মঠস্থাপন ইত্যাদি বিপুল কার্যকলাপের কোনও সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

ভগবান বুদ্ধের জীবনেও নির্বাণলাভের পর দেখা যায় জগতের প্রতি অসীম করুণা, যে-জগতকে তিনি সাধন অবস্থায় 'মারের রাজত্ব' বলে প্রবল উপেক্ষা করেছিলেন। অবশ্য শৈশব থেকেই তাঁর মনে জীবের প্রতি করুণার ভাব অত্যন্ত বেশি ছিল—তীরবিদ্ধ পাখিকে শুশ্রূষা করে বাঁচানো বা হলকর্ষণে মৃত অসংখ্য জীবের কথা ভেবে স্তব্ধ ধ্যানমগ্ন হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা থেকেই তা বোঝা যায়। সিদ্ধার্থের সংসারত্যাগের পিছনেও রয়েছে ওই করুণা। জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখময় ক্রন্দন তাঁর অন্তরকে মথিত করেছিল। জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর কবল থেকে মানুষকে রক্ষা করার পথ খুঁজতে তিনি বেরিয়েছিলেন নিশ্চিন্ত ভোগসুখের রাজ্যপাট ছেড়ে। বোধিলাভের পর মানুষকে তাঁর নিজের লব্ধ শান্তি-আনন্দের ভাগী করতেই তাঁর পথে পথে ঘোরা। তাঁর জীবনব্যাপী মহাকর্ম, যুগপ্রয়োজনে মহাকর্তব্য সম্পাদন—এই সবকিছুর বাদীস্বর একটিই—তা হল তাঁর মহাকরুণা। তথাগতের করুণার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির পাতায় পাতায়—আমরা তারই দিগ্‌দর্শন করব।

সদ্য বোধিলাভের পর ভগবান বুদ্ধ মনস্থ করলেন, পাঁচ সাধনসঙ্গীকে প্রথম জানাবেন তাঁর জ্ঞানলাভের বার্তা। সিদ্ধার্থ যখন আহারনিদ্রা-স্নান ত্যাগ করে সুকঠোর সাধনায় দেহপাত করছিলেন তখন এঁরা তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। পরে ওই অমানুষিক কঠোরতা নিষ্ফল বুঝে সিদ্ধার্থ পরিমিত আহারাদি করতে আরম্ভ করলে, তিনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়েছেন ভেবে এঁরা তাঁকে ত্যাগ করেন। এখন দূর থেকে বুদ্ধকে আসতে দেখে ওই পাঁচজন ঠিক করলেন, তাঁকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়াবেন না বা সম্ভাষণও করবেন না, কথা বলা তো দূর! কিন্তু বুদ্ধদেব কাছে এলে তাঁর জ্ঞানদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখে সকলেই অভিভূত হয়ে পড়লেন। ছুটে এসে কেউ তাঁকে আসন দিলেন, শশব্যস্ত হয়ে কেউ পা ধোয়ার জল এগিয়ে দিলেন, কেউ ভিক্ষাপাত্রটি তাঁর হাত থেকে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলেন। বুদ্ধ তাঁদের দিলেন সেই মহাসম্পদ—বোধিসঞ্জাত অমূল্য উপদেশ।[২] এঁরা তাঁকে হীন ভেবে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন—এই স্মৃতি বুদ্ধের মনে কোনও বিরূপতা জাগাল না। করুণা স্বার্থহীন, তাই তাতে অভিমানের অবকাশ থাকে না। তথাগতের করুণাবারি বর্ষণ আরম্ভ হল। তাঁরাও মহাভাগ্যধর—মনে দ্বিধা, সংশয় না রেখে সেই করুণা মাথা পেতে নিলেন। আগুনের পরশমণি ছুঁয়ে জ্বলে উঠতে লাগল একের পর এক প্রদীপ। এঁরাই তাঁর প্রথম শিষ্য—যাঁরা বিশাল বৌদ্ধসঙ্ঘের ভিত্তি।

একবার বৈশালী নগরী মহামারী-কবলিত হল। অসহায় মানুষ নিরুপায় হয়ে ভগবান বুদ্ধকে সেই মরণতাণ্ডবের মাঝে এসে তাদের উদ্ধারের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাল। মহাকারুণিক তখনই সিদ্ধান্ত নিলেন, বৈশালী যাবেন। যাত্রাপথে ছিল পাঁচশো ছত্রধারী। মনে মনে সকলেরই ঐকান্তিক প্রার্থনা—তথাগত যেন তারই ছাতার তলায় চলেন। বুদ্ধের এমন করুণা যে, প্রত্যেকেই দেখতে লাগল ভগবান তার ছাতার নিচে চলেছেন। অনন্যমন ভক্তের একাগ্র ব্যাকুল শুভ ইচ্ছাটি ভগবান কি পূর্ণ না করে পারেন? জীবিকা, মান—সবদিক থেকেই সমাজের

চোখে তারা হীন, কিন্তু ‘ভগবান মন দেখেন’। সেদিনকার আনন্দের গৌরবের স্মৃতি সেই ছত্রধরবাহিনীর প্রত্যেকের কাছে চিরজীবনের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

বৈশালী পৌঁছে শিষ্য আনন্দকে দিয়ে বুদ্ধদেব নগরীর চারদিকে ঘুরে রতনসুত্ত পাঠ এবং নিজের ভিক্ষাপাত্র থেকে শান্তিবারি সিঞ্চন করালেন। মহামারী ধীরে ধীরে কমে গেল।[৩] বুদ্ধদেব বিভূতি প্রদর্শনের বিরোধী ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় মানুষের দুঃখ-কষ্টে বিচলিত হয়ে তিনি অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করেছেন। করুণা কূলপ্লাবিনী—বন্যার মতো। সে যেমন কোনও নিয়ম মানে না, তেমনি হিসেব করেও চলে না। অবতার হেন দৃঢ়সংকল্প পুরুষও করুণার আকর্ষণে সংকল্পচ্যুত হন, অথবা তাঁদের করুণা প্রকাশ করার জন্যই এমনভাবে দৈবী লীলা ঘটে। প্রসঙ্গত শ্রীরামকৃষ্ণদেবও ছিলেন সিদ্ধাইয়ের ঘোর বিরোধী, তবু রোগশোকে জর্জরিত মানুষের কষ্টে বহুবার তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বা দেবীর[৪] অথবা মধু ডাক্তারের পুত্র রাজকুমার দাসের[৫] প্রাণান্তক ব্যাধি আরোগ্য করার ঘটনা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

তথাগতের জীবনে অঙ্গুলিমালের ঘটনাটি বিখ্যাত।[৬] রাজা প্রসেনজিতের পুরোহিতের ছেলে সে। কোষ্ঠীতে ছিল, বড় হয়ে এ-ছেলে ডাকাত হবে, নরহত্যা করবে। বাবা চেয়েছিলেন এমন ছেলেকে মেরে ফেলতে। দয়ালু রাজাই তাঁকে বাঁচিয়ে রাখেন। জাতকের নাম রাখা হল ‘অহিংসক’, পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হল তক্ষশিলায়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রটির বিরুদ্ধে গুরুর মন বিষিয়ে দিল ঈর্ষাকাতর সহাধ্যায়ীরা। গুরু তাকে তাড়াবার জন্য বললেন, সে যদি এক হাজারটি নরহত্যা করে তাদের একটা করে আঙুল দিয়ে মালা তৈরি করে দেয়, তবেই তিনি তাকে শিক্ষা দেবেন। এরপর অহিংসক হয়ে উঠল দুর্দান্ত দস্যু। বনে থাকতে লাগল, যাত্রী মানুষদের মেরে একটা করে আঙুল কেটে নিতে লাগল। নাম হল অঙ্গুলিমাল। তথাগত কারও বারণ না শুনে একদিন সেই বনের পথে চললেন তাকে বিরত করতে। সেদিন দস্যু আর একজন মানুষ মারলেই হাজার সংখ্যা পূর্ণ করবে। কাজেই ভগবান বুদ্ধকে দেখে সে তাঁর পিছনে ছুটতে লাগল। ভগবান স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ধীরগতিতে হেঁটে চলেছেন, কিন্তু দস্যু ছ-ক্রোশ দৌড়েও তাঁর নাগাল পেল না। শেষে বুদ্ধদেব তাকে ধর্মোপদেশ দিতে লাগলেন। পূর্বজন্মের কথা দস্যুর মনে পড়ে গেল। চোখের জলে ভিজে গেল শরীর। বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ নিয়ে দস্যু হল ভিক্ষু। পরে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করলে তাকে ভগবান সান্ত্বনা দিতেন : ‘‘ওসব তোমার পূর্বজন্মের ঘটনা। ইচ্ছে করে তুমি একটাও প্রাণীহত্যা করনি। এখন তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে।” মহানৃশংসতার সামনে দাঁড়িয়ে তার উজানগতি পরিবর্তনের চেষ্টা, এবং সে-চেষ্টায় সফল হওয়ার পরেও অনুতপ্তকে তার অকল্পনীয় নিষ্ঠুরতার কথা মনে করিয়ে না দিয়ে মধুর সান্ত্বনা—যাতে সে পাপবোধে দগ্ধ না হয়ে নবীন আশা-আনন্দে নতুন জীবন শুরু করতে পারে—এই অসীম করুণার কোনও পরিমাপ হয় কি?

মগধের রাজা বিম্বিসার বুদ্ধের মহাভক্ত, কিন্তু তাঁর পুত্র অজাতশত্রু ছিলেন বুদ্ধবিদ্বেষী। বুদ্ধদেবের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্তের কুপরামর্শে অজাতশত্রু পিতাকে বন্দি করে রাজ্যে বুদ্ধ-উপাসনা নিষিদ্ধ করেন। তাঁর আরও ইচ্ছা হল, পিতাকে অনাহারে রেখে হত্যা করবেন, সেজন্য কারাগারে খাবার পাঠানোও বন্ধ করলেন। অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ভদ্র জন্মালে সে-সংবাদ পেয়ে তাঁর খুব আনন্দ হল। আর সেই মুহূর্তেই মনে জাগল, তিনি যেদিন জন্মেছিলেন তাঁর পিতাও তো এমনই আনন্দে

উদ্বেল হয়েছিলেন। আর আজ? তখনই উদ্‌ভ্রান্ত অজাতশত্রু ছুটে গেলেন বন্দিশালায়, কিন্তু তার একটু আগেই বিম্বিসার মারা গিয়েছেন। দুঃখে অনুশোচনায় হৃদয় বিদীর্ণ হতে লাগল অজাতশত্রুর। সঙ্গে সঙ্গে জাগল কর্মফল ভোগের ভয়। অনুক্ষণ মনে হতে লাগল, তাঁর ছেলে উদয়ভদ্রও তাঁকে অমন করে হত্যা করবে। রাত্রে ঘুম আসে না, চোখ বুজলেই দেখেন উদয়ভদ্র আসছে খোলা তরোয়াল হাতে। কয়েকজন সাধুসন্তের কাছে গিয়েও শান্তি পেলেন না অজাতশত্রু। শেষে রাজবৈদ্য জীবক তাঁকে তথাগতের কাছে নিয়ে গেলেন।[৭] রাজার বুদ্ধবিরোধিতা সর্বজনবিদিত, কিন্তু ভগবান তাঁকে সহজভাবে ভালবেসে গ্রহণ করলেন, উপদেশ দিয়ে অন্তর ভরে দিলেন শান্তিতে। দয়া দিয়ে ধুয়ে অনাবিল করে দিলেন আরও একটি মলিন জীবন। জীবন যখন শুকায়ে যায়, তখনই তো তিনি করুণাধারায় আসেন! সেই ধর্মদেশনা রাজাকে কতটা শান্তি দিয়েছিল, অজাতশত্রুর জবানিতে তার বর্ণনা আছে সূত্রপিটকের শ্রামণ্যফলসূত্রে। বৃষ্টি যখন পড়ে, তার জলধারা পাপী-পুণ্যবান বাছে না, গঙ্গা-নর্দমা বাছে না। তথাগতেরও করুণার অশ্রান্ত বর্ষণ চলেছিল পাত্র-নির্বিশেষে।

করুণায় আছে শাসনেরও স্থান। ''শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে।'' একবার কৌশাম্বী বিহারে দুই উপাধ্যায় ও তাঁদের শিষ্যদের মতান্তর ঘটে। তথাগত স্বয়ং শান্তিস্থাপনের চেষ্টা করলেও যুক্তি-প্রতিযুক্তিতে বিবাদ বেড়েই চলে। শেষে তিনি বিহার ছেড়ে চলে গেলেন শ্রাবস্তীতে। কৌশাম্বীর মানুষ এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ করল। শ্রমণেরাও নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে শ্রাবস্তীতে গিয়ে বুদ্ধদেবের চরণে ক্ষমাভিক্ষা করলেন। তিনি তো ক্ষমা করবেন বলেই বসেছিলেন, সস্নেহে শেখালেন দ্বন্দ্ব-সমাধানের সূত্রটি।[৮] ''ভাবি ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।''

একবার শ্রেষ্ঠী সুদত্ত[৯]—অনাথদের অন্ন দান করতেন বলে নাম অনাথপিণ্ডদ বা অনাথপিণ্ডক—তাঁর রাজগৃহবাসী আত্মীয় এক শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন, গৃহস্বামী মহাব্যস্ত—অতিথির দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দাসদাসীদের কাজের তদারক করছেন। অনেকক্ষণ পর তাঁর একটু সময় হলে অনাথপিণ্ডদ এই ব্যস্ততার কারণ জানতে চাইলেন—''তোমার বাড়িতে কি কাল মহাযজ্ঞ হবে, না বিবাহ হবে, না মগধরাজ স্বয়ং অতিথি হবেন?'' গৃহস্বামী জানালেন, সেসব কিছুই নয়। তাঁর বাড়িতে আসবেন ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ 'বুদ্ধ'। শব্দটি অনাথপিণ্ডদের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করল। অজানা এক শ্রদ্ধায় তিনি অভিভূত হলেন। তখনই ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, কিন্তু শুনলেন পরদিন সকালের আগে তা সম্ভব নয়। রাত্রে ঘুম হল না, বারবার জেগে উঠতে লাগলেন সকাল হয়ে গিয়েছে ভেবে। শেষে ভোররাত্রে—তখনও চারদিকে গাঢ় অন্ধকার—অনাথপিণ্ডদ চলে গেলেন সীতবনে, যেখানে তথাগত রয়েছেন। ভগবান তখন মুক্ত অঙ্গনে পাদচারণ করছিলেন। তিনি তাঁকে দেখে 'এসো সুদত্ত'—বলে মধুর-গম্ভীর আহ্বান জানালেন। সেই দিব্য আহ্বান শ্রেষ্ঠীর দেহে-মনে অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে দিল। সুদত্ত নামটি তাঁর মাতাপিতা ছাড়া কারও জানা ছিল না; এবং তিনি ভেবে রেখেছিলেন—যদি ভগবান আমার এ-নামটি বলতে পারেন তবেই তাঁর মহিমা বুঝব।[১০] সুদত্ত ছুটে গিয়ে তথাগতের চরণে মাথা রাখলেন, আবেগমথিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—''ভগবানের সুখনিদ্রা হয়েছে তো?'' সুগতের ধীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল : ''যে নির্বাণপ্রাপ্ত, যার কোনও বাসনা নেই, আসক্তি নেই, ভয় নেই, যার চিত্ত সম্পূর্ণ শান্ত, সে-ই সুখে নিদ্রা যায়।''

সেই শুরু। সুদত্ত ভগবানের করুণায় অভিষিক্ত

হতে লাগলেন। কতবার শিষ্যমণ্ডলী সহ বুদ্ধদেবকে তিনি ভিক্ষা দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। একবার তথাগতের কথামতো শ্রাবস্তীতে তিনি নির্জন একটি বর্ষাবাসের (বর্ষাকালের চারমাস তথাগত একই স্থানে থাকতেন, তারই নাম বর্ষাবাস) স্থান খুঁজতে লাগলেন, যেটি লোকালয় থেকে খুব দূরেও নয় আবার কাছেও নয়। রাজা প্রসেনজিতের পুত্র কুমার জেত এমন একটি উদ্যানের অধিকারী ছিলেন। সেইটিই সুদত্তের খুব পছন্দ হল। জেত বললেন, পুরো বনের জমি যদি মুদ্রা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় তবেই তিনি বনটি দেবেন। আঠারো কোটি কার্ষাপণ বিছিয়ে সুদত্ত সে-বন ক্রয় করে তথাগতের সেবায় অর্পণ করেন। ভগবান সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বর্ষাবাস (পঁচিশটি) এই জেতবনেই কাটিয়েছেন। ত্রিপিটকে সংকলিত উপদেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপদেশ এই জেতবনেই প্রদত্ত হয়েছে। হাজার হাজার ভিক্ষুর সাধনস্থান, বহু মানুষের বোধিলাভের স্থান এই পবিত্র বন।

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ বৃদ্ধবয়সে ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে দরিদ্র হয়ে পড়েন। কিন্তু প্রাণের জেতবনকে তিনি ভুলতে পারেননি। মাঝে মাঝেই আসতেন কিছু হাতে নিয়ে। কিছুই না আনতে পারলে রাপ্তী নদীর বালি এনে প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিতেন। বাইরে তাঁকে রিক্ত করে ভগবান তাঁর অন্তর শান্তিতে আনন্দে পূর্ণ করেছিলেন।

বুদ্ধের শেষ আহার সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়ে গিয়েছে। আজ গবেষকরা প্রায় সকলেই একমত যে, সেটি ছিল শূকরমাংস। সেইসময় এটি জনপ্রিয় ও সুলভ আহার্য ছিল। স্বর্ণকার চুন্দ প্রদত্ত এই গুরুপাক খাদ্য গ্রহণ করে তথাগত রক্ত-আমাশয়ে আক্রান্ত হন। তিনি শিষ্য আনন্দকে ডেকে বলেন, তাঁর দেহত্যাগের পর কেউ যেন চুন্দকে দোষারোপ না করে। আনন্দ যেন চুন্দকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, স্বয়ং ভগবান বলে গিয়েছেন যে তাঁর জীবনে দুটি আহার্য সবচেয়ে বেশি ফলদায়ী হয়েছে—একটি হল বোধিলাভের পূর্বে সুজাতার দেওয়া পায়েস, অপরটি মহানির্বাণের আগে চুন্দের দেওয়া খাদ্য। এটি গ্রহণ করেই তিনি চিরনির্বাণে লীন হয়েছেন—তাই এটি মহামহিমান্বিত, চুন্দের মহাকল্যাণ হবে।

ক্ষতিকর খাদ্য-পরিবেশকের প্রতি জনগণের ক্রোধ অনুমান করে অশক্ত অসুস্থ দেহে তথাগত যেভাবে তাঁর মঙ্গলচিন্তা করেছেন, তা তাঁর মহাকরুণার পরিচয় দেয়। এই করুণারই প্রেরণায় মহাপরিনির্বাণের কয়েক ঘণ্টা আগেও তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুভদ্রের প্রশ্নের উত্তরদান এবং তাঁকে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষাদান। সুভদ্রকে শিষ্য আনন্দ বুদ্ধের কাছে যেতে বারণ করলে তিনি শুনতে পেয়ে সুভদ্রকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বলেন। এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শেষজীবনে রোগক্লিষ্ট শরীরে সেবকদের বারণ অগ্রাহ্য করে বহু মানুষকে অধ্যাত্ম-জ্ঞান দান; সেই স্মরণীয় উক্তি : ভাবি এই শরীরটা তো যাবেই, তবু এদের হোক। শ্রীমা সারদা দেবীর অন্তিমজীবনেও এমন ঘটনা রয়েছে। দর্শনপ্রার্থীকে সেবক বাধা দিচ্ছেন শুনতে পেয়ে তিনি এত বিরক্ত ও উত্তেজিত হন যে, স্বভাবগত লজ্জাশীলতা ছেড়ে অন্তঃপুর থেকে আলুথালুভাবে বেরিয়ে এসে সেবককে বলেন, ‘‘কেন তুমি আসা বন্ধ করছ?... আমাদের ঐ জন্যেই আসা। আমি ওকে দীক্ষা দেব।’’[১১]

শুধু কি মানুষ-পশুপাখি? কত গ্রাম-নগর জনপদ, নদী, বৃক্ষলতা তথাগতের চিত্তের প্রসাদ লাভ করেছে! তিনি ছিলেন প্রকৃতিপ্রিয়। পরিণত বয়সে সাধনজীবনের কথা উঠলে স্মৃতির সরণি বেয়ে বলতেন—আমি তখন অমুক নদীর তীরে অমুক গাছটির তলায় থাকি। বিশেষ করে নৈরঞ্জনা নদীর কথায় তাঁর মন যেন গলে যেত। জীবনের সায়াহ্নবেলায় প্রিয়শিষ্য আনন্দের কাছে উজাড় করে

বলেছিলেন প্রাণের কথা। চৈত্য, আরাম ও পর্বতগুলির নাম করে করে জানিয়েছিলেন, ওইসব সুন্দর স্থান তাঁর মনে সর্বাবস্থায় জাগরূক হয়ে থাকে। শেষবার বৈশালী নগরীতে ভিক্ষা করে ফেরার পথে বৈশালীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বুদ্ধের কৃপাঘন কণ্ঠ করুণসুরে বেজে উঠেছিল : ''আনন্দ, তথাগতের এই শেষ বৈশালী দর্শন!''[১২] বৈশালী তখনও জানে না, ভগবানের বাণী সে আর শুনতে পাবে না, তার বাটে তাঁর চরণচিহ্ন আর পড়বে না! কিন্তু তার আসন্ন দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে নির্মোহ মহাপুরুষের মন করুণায় আত্মহারা!

দূরদূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের বর্ষার অঝোর বারিপাতে বিব্রত দেখে পূজনীয় ভূতেশানন্দজী মহারাজ বলতেন, ''মনে করবে করুণাধারা।'' ভগবান বুদ্ধের জীবনের দিকে তাকালে মনে হয়, পূর্বোক্ত উপমান-উপমেয় যেন পরস্পর স্থানবিনিময় করেছে। সেখানে করুণাবর্ষণকেই উপমিত করা যায় ঘনবর্ষার ধারাসারের সঙ্গে। অবতারপুরুষদের সকলেরই জীবন করুণার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত, করুণার আকর্ষণেই তাঁদের দেহধারণ এবং সারা জীবনের কার্যকলাপ। তবু তাঁদের মধ্যে ভগবান বুদ্ধকেই বলা হয় করুণার অবতার। বহু শতাব্দীর কুহেলি ভেদ করে আজও তাঁর করুণার কিরণসম্পাত আমাদের মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়। জয়দেব তাঁর দশাবতারস্তোত্রে সব অবতারদের কীর্তি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু অপার হৃদয়বত্তার কথা তাঁর মনে হয়েছে[১৩] শুধুমাত্র বুদ্ধদেবের কথা বলতে গিয়েই। বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে নির্বাণের ধারণাটি ওতপ্রোত—যে-নির্বাণে কামনা-বাসনার লয়, অহংকারের লয়, জগতের লয়, এমনকী মনেরও লয়—যে-অবস্থাকে শূন্যতা বলা হয়েছে। তথাগতের এই মহাশূন্যে লীন চিত্তবৃত্তিকে করুণা কীভাবে সম্পৃক্ত করে ফেলল, তা নিয়ে তত্ত্বান্বেষীরা বিবাদ করুন। আপাতত আমাদের এই সিদ্ধান্ত : যেমন 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' ব্রহ্মসূত্র অনুসারে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের লীলাবিলাস এই জগৎসৃষ্টি—কোনও কারণ ছাড়াই, ঠিক তেমনি নির্গুণ নিরাকার নির্বাণলোকে অধিষ্ঠান সত্ত্বেও, কোনও কারণ ছাড়াই জগতের প্রতি করুণা অনুভব সম্ভব। এ যেন 'অরূপসায়রে লীলালহরী উঠিল মৃদুল করুণাবায়।'

যুগান্তরের ব্যবধান ঘুচিয়ে তথাগতের সেই করুণাবায় নিখিল মানবাত্মার সন্তপ্ত প্রাণ জুড়িয়ে দিক—এই প্রার্থনা।

তথ্যসূত্র ও মন্তব্য

১। শ্রীম, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১), পৃঃ ৯৯

২। দ্রঃ চিত্রা দেব, *বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ২০১৩), পৃঃ ২৩

৩। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৩৪-৩৫

৪। দ্রঃ স্বামী সারদানন্দ, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০০), ভাগ ১, সাধকভাব, পৃঃ ১৭১

৫। দ্রঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *শ্রীরামকৃষ্ণ ও দক্ষিণেশ্বরের মানুষ* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০৯), পৃঃ ৭৯-৮০

৬। দ্রঃ *বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন*, পৃঃ ৪৭-৪৮

৭। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৬৩

৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ৪৪-৪৫

৯। দ্রঃ রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *মহামানব বুদ্ধ*, অনুবাদ : অভিজিৎ ভট্টাচার্য (চিরায়ত প্রকাশন : কলকাতা, ১৪২০), পৃঃ ২৪-২৭

১০। এধরনের ঘটনা আজও ঘটে। এক ভক্তমহিলাকে স্বামী ভূতেশানন্দজী এমন একটি নামে ডাকতেন, যে-নামে তাঁকে বহুকাল আগে শুধুমাত্র তাঁর জননীই সম্বোধন করতেন।

১১। দ্রঃ *শ্রীশ্রীমায়ের কথা*, অখণ্ড (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ৩৩০

১২। *মহামানব বুদ্ধ*, পৃঃ ৩৩

১৩। 'সদয়হৃদয়-দর্শিতপশুঘাতম্'